নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১২ পৃ : ৪৭-৬২
© ২০০৭ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

'নতুন কৃষি' ও বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোর পরিবর্তন[১]

রঞ্জন সাহা পার্থ*

১. ভূমিকা

গত দু দশক যাবত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর চিরায়ত কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে (World Bank,2007)। কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণসহ প্রতিটি স্তরেই এ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পূর্বে যেখানে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য বিক্রির জন্য কাঁচাবাজার কিংবা হাট- এর মতো জায়গা মূখ্য ভূমিকা পালন করতো, বর্তমানে শহরাঞ্চলে 'সুপার মার্কেট' তার একটা বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে । এ ধরনের ব্যবস্থায় কৃষিজাত কাঁচা পণ্য (যেমন সবজি, মাছ) প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ফ্রিজিং, প্যাকেটিং এর মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে দেশী বিদেশী অনেক প্রতিষ্ঠান কৃষি ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হচ্ছে। কৃষিপণ্য রপ্তানিকারী ও এগ্রো সুপারমার্কেটের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে একদিকে যেমন নতুনভাবে প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের ভোক্তা নির্মাণের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে অপরদিকে উৎপাদন বৃদ্ধির উপরও জোর দিচ্ছে। এমতাবস্থায় নতুন এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ভোক্তা নির্মাণের জন্য গণমাধ্যম নির্ভর হয়ে পড়েছে এবং গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে 'নিবিড় পদ্ধতি'তে কৃষি উৎপাদন শুরু করেছে।

বাংলাদেশে প্রথাগত কৃষি ব্যবস্থায় কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে গৃহস্থালীর শ্রম ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জমিতে কি ধরনের ফসল উৎপাদিত হবে, কোথায় বিক্রি করা হবে, কিরূপে বিক্রি করা হবে সেক্ষেত্রে কৃষকের/ উৎপাদকের সিদ্ধান্ত ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তনের ফলে কৃষির চিরায়ত রূপেরও পরিবর্তন ঘটছে যাকে অনেকেই 'নতুন কৃষি' বলে অভিহিত করেন।[২] 'নতুন কৃষি' ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রামীণ কৃষি কাঠামোর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করতে গিয়ে গৃহস্থালীভিত্তিক উৎপাদনের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে এবং খামারভিত্তিক উৎপাদনের সূত্রপাত ঘটছে।

---

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২.
ই-মেইল: parthoju@gmail.com

'নতুনকৃষি' ব্যবস্থায় উৎপাদক-ভোক্তার মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, উৎপাদক ভোক্তার নিকট সরাসরি পণ্য বিক্রি করছে না, এখানে জন্ম নিচ্ছে মধ্যসত্বভোগী শ্রেণী। ফলে কৃষি ব্যবস্থাপনা পরিস্থিতি প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। গ্রামীণ সমাজে কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী জনগোষ্ঠী 'নতুনকৃষি' ব্যবস্থাকে কিরূপে দেখছে, তারা এ ধরনের ব্যবস্থার সাথে কিভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছে এবং 'নতুনকৃষি' ব্যবস্থা কিরূপে তার ভোক্তা নির্মাণ করছে- তা বিশ্লেষণ করাই এই প্রবন্ধের মূখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। ভূমিকার পর তত্ত্বীয় আলোচনার মাধ্যমে নতুনকৃষি বলতে প্রবন্ধে কি বোঝানো হযেছে তা আলোচনা করা হবে। এরপর 'নতুনকৃষি' ব্যবস্থায় কোন প্রক্রিয়ায় কৃষিজাত দ্রব্য পণ্যকরণ করা হচ্ছে বা কিভাবে 'নতুনকৃষি' তার ভোক্তা নির্মাণ করছে এবং এই ব্যবস্থা গ্রামীণ কৃষক সমাজের আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলেছে তা তুলে ধরা হবে। সবশেষে রয়েছে উপসংহার ও মন্তব্য।

২. তত্ত্বীয় আলোচনা

সমাজ বিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে কৃষি কাঠামো নিয়ে বিস্তর লেখালেখি ও গবেষণা কাজ রয়েছে। ৩০'র দশক হতে সমাজবিজ্ঞানীদের গভীর আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় 'কৃষক সমাজ' অধ্যয়ন করা। এ সময়কালে কৃষক সমাজকে 'আধুনিক' হতে ভিন্ন হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে (Kearney,1996)[৩] এসময়কালে যারা 'কৃষক সমাজ' নিয়ে তত্ত্ব প্রদান করেন তাদের মধ্যে চায়ানভ (Chayanov, 1925), উল্ফ (Wolf, 1966), শানিন (Shanin, 1972) অন্যতম, যারা কৃষক সমাজকে একটা 'স্বতন্ত্র' সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করেন। গবেষকগণ মনে করেন কৃষকরা আদিম ও আধুনিক সমাজের মাঝামাঝিতে অবস্থান করে। গ্রামীণ কৃষক সমাজের মাঝে যে ভিন্নতা ও শ্রেণী বিভাজন রয়েছে, শহরের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির কারণে কৃষকরাও যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু করতে পারে। সর্বোপরি কৃষক সমাজ যে পরিবর্তিত হতে পারে তা চায়ানভ, শানিন, রেডফিল্ডদের কৃষক সমাজের চিত্র বর্ণনার দ্বারা বোঝা সম্ভব নয় (আইয়ূব, ২০০৪)। তাই এদের তত্ত্ব কৃষির পরিবর্তিত রূপ বুঝতে সমস্যা সৃষ্টি করে।

কৃষক সমাজ সম্পর্কিত প্রাথমিক গবেষণা সমূহ যেভাবে কৃষক সমাজকে 'সমস্বত্ব' হিসেবে দাঁড় করায় মার্ক্সবাদী গবেষকরা এই সমস্যা থেকে অনেকটা বের হয়ে আসেন এবং তারা বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ অধ্যয়নকালে গ্রামীণ কৃষক সমাজের মধ্যেই যে শ্রেণীবিভাজন রয়েছে তা তুলে ধরেন। বার্টোসি (Bertocci,1970) মার্ক্স ও ম্যাক্স ওয়েবারের সামাজিক কাঠামোগত অন্তঃদৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষক

সমাজের শ্রেণীকাঠামো তুলে ধরেন[৪]। তিনি দেখান যে, "বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবি। এদের মধ্যে যাদের জমির পরিমাণ বেশী তারা উচ্চবিত্ত, যাদের জমির পরিমাণ কম তারা নিম্নবিত্ত কৃষক। এই উঁচু-নিচু বিন্যাসের জটিলতা থেকে বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। উঁচু এবং মধ্যবিত্তের শোষণে নিম্নবিত্তরা ভূমিহীনে পরিনত হয়। সামাজিক মান মর্যাদাও এই জমির পরিমানের উপর অধিক নির্ভরশীল"। বাট্টোসি কৃষক সমাজের শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সম্পদের উপাদান হিসেবে ভূমিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন।

একইভাবে, ওয়েস্টারগার্ড (1980) বগুড়া জেলার শেরপুরের বরিন গ্রামে গবেষণা করে দেখান যে, সেখানকার গ্রামাঞ্চলে ধনতন্ত্রী কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটেনি। তাঁর মতে, বর্তমান বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া চালু রয়েছে তা 'নিঃস্বভবন' প্রক্রিয়া। তিনি এক্ষেত্রে মার্ক্সীয় পদ্ধতির ন্যায় উৎপাদন উপকরণ ভূমির উপর ভিত্তি করে গ্রামীণ গৃহস্থালীকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেন- ১. ভূমিহীন, ২. প্রান্তিক, ৩. খোরাকী, ৪. উদ্বৃত্ত। কিন্তু ভূমি ছাড়াও অন্যান্য উপাদানও যে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে যা কৃষক সমাজ শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে তা এসব গবেষণায় আলোচিত হয়নি। এছাড়া কৃষক হিসেবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণের মধ্যদিয়ে গ্রামীণ সমাজের ভিন্নতা, পেশাগত পার্থক্য এমনকি গ্রামীণ জনগোষ্ঠী যে কৃষি ছাড়াও অন্য কোন পেশার সাথে যুক্ত থাকতে পারে তা তাঁর কাজ দ্বারা বোঝা যায় না। তাঁর কাজে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাদের ' কৃষক' হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তা স্পষ্ট হয় না। সর্বোপরি তাঁর গবেষণা কাজে গ্রামীণ সমাজের একটি স্থির চিত্র উপস্থাপন করা হয় যা সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন বুঝার জন্যও যথেষ্ট নয় ।

বি. কে. জাহাঙ্গীর (১৯৯৩) কৃষক সমাজের পৃথকীকরণ, মেরুকরণ ও বিরোধের প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে জমির উপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ অসম। জমি পরিণত হয়েছে একটি পণ্যে। অল্প সংখ্যক কৃষক ধনী, অধিকাংশই দরিদ্র। ধনী কৃষকরা যখন অর্থকরী শস্যের প্রতি কেন্দ্রীভূত, গরীব কৃষকরা তখন ভোগ্য শস্য নিয়ে ব্যস্ত। কৃষিজ উদ্বৃত্ত বাজারে বিক্রি হয়। এই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। মূলধন পুঁজিভূত হয়, এর কিছু অংশ কৃষি বর্হিভূত খাতে বিনিয়োগ করা হয়। শহুরে বিনিয়োগকারীরা কৃষিতে বিনিয়োগ করে। বাংলাদেশের কৃষক সমাজের সমস্যা সম্পর্কে বি.কে জাহাঙ্গীর বলেন, এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে ঔপনিবেশিক মূলধন গঠনকে কেন্দ্র করে। মূলধনের এ গঠন প্রক্রিয়া পুঁজিবাদী কাঠামোতে কৃষকদের মধ্যে বৈষম্যকে বাড়িয়ে তোলে। ষাটের দশকের পরে কৃষি থেকে আরও বেশি পরিমাণ উদ্বৃত্ত আহরণের উদ্দেশ্যে

তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্র আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিয়েছে; যা সবুজ বিপ্লব হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বি. কে. জাহাঙ্গীর বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোর পরিবর্তন প্রসঙ্গে 'সবুজ বিপ্লব'- এর কথা উল্লেখ করেন। 'সবুজ বিপ্লব' কিভাবে শ্রেণী বৈষম্যকে বাড়িয়ে তোলে তা উল্লেখ করার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী ছিলেন।

উপরিউক্ত গবেষকগণ বাংলাদেশের কৃষক সমাজ নিয়ে গবেষণাকালে মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুসরণ করে শুধুমাত্র গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির বর্ণনা প্রদান করেন। মার্ক্সবাদ যেভাবে ব্যবহার মূল্য (use value) ও বিনিময় মূল্যের (exchange value) দ্বারা সমাজ অর্থনীতিকে ব্যাখ্যা করে সমাজের উৎপাদন পদ্ধতিকে তুলে আনার চেষ্টা করে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশে গবেষকগণ যারা কৃষক সমাজ নিয়ে গবেষণা কাজ করেন তারাও গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন কাঠামো তুলে ধরতেই বেশী উৎসাহ বোধ করেন। কিন্তু নতুনকৃষি ব্যবস্থায় 'ভোগ' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করে। আধুনিক এগ্রো সুপার মার্কেটগুলো নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের ভোক্তা নির্মাণ করে। তাই 'নতুন কৃষি' কে বুঝতে হলে ভোগবাদ কে বুঝতে হবে, যা মার্ক্সবাদী গবেষণায় স্থান পায়না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে 'নতুন কৃষি' ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র গ্রামীণ সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবেনা। নতুন কৃষির ভোক্তা হচ্ছে শহুরে জনগোষ্ঠী তাই গ্রামীণ উৎপাদনের পাশাপাশি শহুরে ভোক্তা সমাজকে গুরুত্ব দিতে হবে।

বঁদ্রেয়ার (1979) বর্তমান উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটকে বুঝবার জন্য ব্যবহার মূল্য ও বিনিময় মূল্যের পাশাপাশি চিহ্ন মূল্যের (Sign Value)'র গুরুত্বকে তুলে ধরেন। বঁদ্রেয়ার চিহ্ন মূল্য প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভোগ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এখানে ব্যক্তিসত্ত্বা নির্মিত হয় ভোগ দ্বারা। তাই তিনি বলেন,``We are not what we produce, But what we consume''. বঁদ্রেয়ার ভোক্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকাকে সামনে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, বর্তমান সমাজ জীবনে টিভি, পত্রিকার বিজ্ঞাপন ভোক্তা সংস্কৃতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ধরণের বিজ্ঞাপণের ধরন এতই শক্তিশালী যে, এর প্রভাবে বাস্তব-অবাস্তব, আসল-নকল, সারফেস-গভীর এসবের গুরুত্ব হারিয়ে গিয়েছে (Loss of the Real)। তিনি তাই বর্তমান সমাজে ভোক্তা নির্মাণের সংস্কৃতিকে বলেন Hyper-Reality. এ প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ দেন আমেরিকার ডিজনিল্যান্ড নামক একটি ফ্যান্টাসির, যা বাস্তব নয়। কিন্তু একে এমনভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে যেন মনে হয় বাস্তবকেই পরিবেশন করা হচ্ছে।

বঁদ্রেয়ারের উপরিউক্ত তত্ত্ব বাংলাদেশের 'নতুনকৃষি'র ভোক্তা নির্মাণ প্রক্রিয়া বুঝবার জন্য যথার্থ ভূমিকা পালন করে। 'নতুনকৃষি' ব্যবস্থায় সুপারমার্কেটগুলোর নিকট

ভোক্তা নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি টিভি বা পত্রিকার বিজ্ঞাপনে প্রায়শই দেখা যায় যে, সুপার মার্কেটগুলো তাদের পণ্য বিজ্ঞাপণের মাধ্যমে পণ্যের প্রতি ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। 'নতুন কৃষি' কিভাবে ভোক্তা নির্মাণ করছে, গ্রামীণ কৃষি ভিত্তিক এই উৎপাদন ব্যবস্থায় কিরূপ প্রভাব ফেলছে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তনে এর প্রভাব ফেলছে তা প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হবে।

৩. 'নতুন কৃষি' কি?

এন্ডি হল (২০০৫) দরিদ্র দেশগুলোর কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখান যে, গত দু দশক যাবৎ বাংলাদেশ, ইথিয়োপিয়া, কেনিয়া, আফ্রিকার মতো অনেক দেশ কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্বারা ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশীয় কৃষিজাত পণ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণের পর তা বিদেশে রপ্তানী করছে, যা কিনা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একই সাথে এসব দেশের অভ্যন্তরীণ কৃষি বানিজ্যের ধরনেও পরিবর্তন এসেছে যেখানে সুপার মার্কেটে কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রি শুরু হয়েছে। এ ধরনের কৃষি ব্যবস্থাকে এন্ডি হল'নতুন কৃষি' বা New Agriculture হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি আরও দেখান যে, এ ধরণের নতুন কৃষি ব্যবস্থায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও এনজিও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের নতুন কৃষিতে উৎসাহ প্রদান করছে, ফলে কৃষকরা বৃহদাকার খামার ভিত্তিক উৎপাদনের সাথে যুক্ত হতে পারছে। এখানে বহু নারী-পুরুষ শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছে। আর এরূপ কৃষি নির্ভর শিল্প ব্যবস্থাকেই Hall বলছেন 'নতুন কৃষি'।

আহমেদ (২০০৫) বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের চিংড়ি চাষকে সামনে নিয়ে আসেন এবং দেখান, বানিজ্যিক ভিত্তিতে যে চিংড়ি চাষ শুরু হয়েছে তা চিংড়ি চাষের ধরনকে পাল্টে দিয়েছে । এখন চিংড়ি চাষের জন্য খামার তৈরী করা হচ্ছে। ধান চাষ যোগ্য জমিকে চিংড়ি চাষের উপযোগী করে তোলা হচ্ছে। এখানে বিদেশী পোনা, খাদ্য, ঔষধ ব্যবহার করা হচ্ছে। এধরনের চাষ চিংড়ি উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছে, যা সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তনেও বিশেষ প্রভাব ফেলছে। এ ব্যবস্থাকে আহমেদ 'নতুন কৃষি' বা New Agriculture হিসেবে অভিহিত করছেন[৫] (World Bank,2007) ।

৪. 'নতুনকৃষি'তে ভোক্তা নির্মাণ প্রক্রিয়া

পূর্বের অংশে বঁদ্রেয়ার এর চিহ্ন মূল্য প্রসঙ্গ আলোচনার মাধ্যমেই দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় 'ভোক্তা'র নির্মাণ ঘটানো হচ্ছে। বঁদ্রেয়ার

(1979) ভোক্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে আসেন যা কিনা ভোগবাদী সমাজ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । বদ্রেয়ার ভোগবাদী সমাজ গঠন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি তথা বিজ্ঞাপন এর কথা উল্লেখ করেন। বঁদ্রেয়ার অনুসরণে যদি বাংলাদেশের ঢাকা শহরের সুপার মার্কেটগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে দেখা যায় যে, এগোরা, মীনা বাজার, সপ এন সেইভ এর মতো এগ্রো সুপার মার্কেটগুলো কিভাবে মানুষের চাহিদাকে পুঁজি করে 'ব্যক্তির' ভোগবাদী সত্ত্বাকে নির্মাণ করছে। এসব সুপার মার্কেট এমন ভাবে তাদের প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে এবং দোকানের সাজ-সজ্জা, সরঞ্জামাদি উপস্থাপন করে যার মাধ্যমে ক্রেতা মার্কেটে পণ্য ক্রয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। এ প্রসঙ্গে 'ক' নামক এগ্রো সুপার মার্কেট এর মালিক মি. আলম বলেন, "যেহেতু এগ্রো সুপার মার্কেট বংলাদেশে তুলনামূলক ভাবে নতুন তাই এখানে ক্রেতাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার জন্য বিজ্ঞাপন, দোকানের সাজ-সজ্জার মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ আমাদের গ্রহণ করতে হয়"। বহুকাল ধরেই বাংলাদেশের মানুষ কাঁচাবাজার থেকেই কৃষিজাত পণ্য ক্রয় করে থাকত। আর এই কাঁচাবাজার থেকে ভোক্তাকে সুপার মার্কেটে নিয়ে আসার জন্য তারা প্রধান কৌশল হিসাবে বিজ্ঞাপনকেই বেছে নেয়।

দৈনিক পত্রিকা, টিভির দিকে চোখ রাখলে প্রতিদিনই দেখা যায় যে, এগোরা, মীনাবাজারের মতো এগ্রো সুপার মার্কেটগুলোর বিজ্ঞাপন চিত্র প্রকাশিত হচ্ছে, যার শিরোনামগুলো থাকে বেশ আকর্ষণীয়, যেমন "এগোরাতে অন্যরকম ধূমধাম" শিরোনামের বিজ্ঞাপন চিত্র হতে এগোরা নামক একটি এগ্রো সুপার মার্কেটের বিভিন্ন পণ্যের (তা মাছই হোক আর সবজি,ডিম,গুড়ো দুধ.....) দাম কিরূপ তা ক্রেতা ঘরে বসেই জানতে পারছে । 'নন্দন' নামক একটি এগ্রোসুপার মার্কেটের "আয়বৃষ্টি ঝেপে ফ্রি নেব মেপে" শিরোনামের বিজ্ঞাপন থেকেও ক্রেতারা জানতে পারে কোন পণ্যে কতটুকু ছাড় দেয়া হয়েছে বা কি কিনলে কি ফ্রি পাওয়া যাবে তার খবর। পত্রিকার এধরণের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ও মূল্যছাড় এগ্রো সুপার মার্কেটগুলোর ক্রেতা বা ভোক্তা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে।

সম্প্রতি ভেজাল বিরোধী অভিযানে এগ্রো সুপার মার্কেটগুলো তাদের বিজ্ঞাপন কৌশলে নতুনত্ব এনে ভোক্তা বাড়ানোর কৌশল গ্রহণ করেছে। সুপার মার্কেটগুলোর পণ্য বেশিরভাগই প্যাকেট বন্দি অবস্থায় থাকে তা চাল, মুড়ি, মাছ, মাংস, মসলা যাই হোক না কেন। এসব প্যাকেটে আবার মূল্য, মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ উল্লেখ থাকে, ফলে যেকোন এগ্রো সুপার মার্কেটই একথা বলতে পারে যে, ''আমরা ভেজাল খাবার রাখি না''। এ ধরণের বক্তব্য তারা আবার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতাদের জানিয়ে দিচ্ছে (যদিও তার সত্যতা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে কেননা এধরণের সুপার

মার্কেট গুলোতেও ভেজাল দ্রব্যের সন্ধান মিলেছে) কৃষি পণ্য বিক্রির এ কৌশলের মাধ্যমে সুপার মার্কেটগুলো জনসাধারণের মধ্যে এরূপ ধারণা এনেছে যে, "প্যাকেটজাত খাবার মাত্রই দূষণ মুক্ত"। এ প্রসঙ্গে এগোরার একজন ক্রেতা মিসেস ফাহমিদা খাতুন (৩৫) বলেন, "আমি কখনই প্যাকেট ছাড়া খোলা খাবার কিনি না। বাইরে যে ধূলো ময়লা তাতে খোলা খাবারের প্রতি আমার কোন ভরসা নাই। প্যাকেটের গায়ে যেহেতু তারিখ, মূল্য লেখা আছে তাই এটা কেনাই সহজ ও স্বাস্থ্য সম্মত।"

ক্রেতার উপরিউক্ত বক্তব্যটি হতে এটা বোঝা যায় যে, সুপার মার্কেটগুলোর প্যাকেট বন্দি খাবার ভোক্তাদের আকৃষ্টকরণে যথাযথ ভূমিকা রাখে। সুপার মার্কেট তার ভোক্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে এভাবেই বিজ্ঞাপন, প্যাকেট বন্দি, মূল্য হ্রাসের মত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করে থাকে। তবে অনেক সময় সুপার মার্কেটগুলো ক্রেতাদেরকে তাদের পণ্যের প্রতি আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য এমন সব কৌশল গ্রহণ করে যে, কোনটি আসল আর কোনটি আসল নয় তা ঐ বিজ্ঞাপন চিত্র দ্বারা বোঝা যায় না। এগোরা একটি বিজ্ঞাপনে তাদের সুপার মার্কেটের হিমায়িত মাছকেও 'টাটকা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হিমায়িত মাছ যে টাটকা মাছ হতে পারেনা তা ঐ বিজ্ঞাপন চিত্র দ্বারা বোঝা যায়না। এ বিষয়টাকেই বঁদ্রেয়ার এর ভোক্তা নির্মাণের 'হাইপার রিয়েল' সংস্কৃতির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। বঁদ্রেয়ার ডিজনিল্যান্ড নামক ফ্যান্টাসির কথা উল্লেখ করে বলেন, এটি একটি ফ্যান্টাসি হলেও মিডিয়াগুলো আমেরিকার বাস্তবতাকে তুলে ধরে। ঠিক একই ভাবে নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এগোরার হিমায়িত মাছকে 'টাটকা' বলার মধ্যদিয়ে বাস্তবতা হারিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া মার্কেটের সাজ-সজ্জা এবং সার্বিক পরিবেশ ভোক্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানের এগ্রো সুপার মার্কেটগুলোতে পণ্য রাখার জন্য চারদিকে তাক রয়েছে যেখানে সবজি, চাল, মাংস, মসলা, মুড়ি সহ অন্যান্য দ্রব্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে, ট্রলি রয়েছে যাতে সহজে মার্কেটের ভিতর ক্রেতা পণ্য পরিবহন করতে পারে, খাবার যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য ফ্রিজ রয়েছে, ক্রেতা যাতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ক্রয় করতে পারে তার জন্য রয়েছে এয়ারকুলার, পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য নগদ ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া এখানে কর্মকর্তা ও কর্মচারী ক্রেতাদের সাহায্যার্থে নিয়োজিত রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট হয় যে, সুপার মার্কেটগুলোর সাজ-সজ্জা ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য যথাযথ ভূমিকা পালন করে। যেখানে একজন ক্রেতা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে একই কক্ষে নির্ধারিত দামে অনেকগুলো পণ্য ক্রয় করার সুবিধা পাচ্ছে। এধরনের সুবিধা কোন কাঁচা বাজারে পাওয়া যাবে না। সুপার

মার্কেটগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে "Pick & Pay", যেখানে এক দরে বিক্রি করার ব্যবস্থা রয়েছে, যা কিনা কাঁচা বাজারে থাকে না। ফলে সুপার মার্কেটে পণ্য ক্রয়ের প্রতি ভোক্তা আকর্ষণ বোধ করে। এক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, সুপার মার্কেটের পণ্যের মূল্য কাঁচা বাজারের তুলনায় বেশি তাই সকল শ্রেণীর মানুষ এখান থেকে পণ্য ক্রয় করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে একজন এগ্রো সুপার মার্কেটের মালিক বলেন, "ক্রেতাদের ভাল পরিবেশে বাজার করার জন্য আমাদের মার্কেটে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় যা কিনা কাঁচাবাজারগুলো করে না। একারণে আমাদের পণ্যের দাম একটু বেশি। এখানকার কেনাকাটার পরিবেশের কারণে ক্রেতারা একটু বেশি দাম দিয়ে পণ্য ক্রয় করেও নিজেদের লাভবান মনে করে"। ক্রেতাদের সাক্ষাৎকার থেকে জানতে পারা যায় যে, এদের প্রায় সকলের পরিবারের মাসিক আয় ৩০ হাজার টাকার বেশি। একটু 'ভাল', 'কোলাহল মুক্ত' পরিবেশে পণ্য ক্রয় করার জন্যই তারা সুপার মার্কেটে আসে। এছাড়া কাঁচা বাজারের ক্রেতা যেখানে অধিকাংশই পুরুষ, সেখানে সুপার মার্কেটগুলোতে নারী ক্রেতার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি।

উল্লেখ্য যে, সপ এন সেইভ, মীনাবাজার, এগোরা'র মতো এগ্রো সুপার মার্কেটগুলো নারীদের বাজারে আনা অর্থাৎ নারী ভোক্তা নির্মাণের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন চিত্র প্রচার করে থাকেন। মীনাবাজার প্রায়শই "আমি সচেতন মা" শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। একজন নারীর ছবি সম্বলিত এই বিজ্ঞাপন চিত্র দেখায় যে, মীনাবাজারে একজন 'নারী হয়েও' বাজারে এসে সঠিক দামে দ্রব্য ক্রয় করছে। আর এর মধ্য দিয়ে একভাবে 'সচেতন মা' এর পরিচিতি নির্মাণ ঘটানো হচ্ছে। এধরনের বিজ্ঞাপন সুপার মার্কেটগুলোতে নারী ভোক্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ ধরনের ভোক্তা সুপার মার্কেটে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করাকে নিজেদের নির্দিষ্ট মর্যাদা (status) ধরে রাখাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে। তাই সুপার মার্কেটগুলো 'ব্যক্তির সত্ত্বা' নির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সুপার মার্কেটগুলো ভোক্তা নির্মাণের মাধ্যমে 'ব্যক্তি সত্ত্বা' বোধ তৈরী করছে-এ প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে বঁদ্রেয়ার এর চিহ্ন মূল্য সম্পর্কিত তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেখানে বঁদ্রেয়ার উল্লেখ করেন, *I am what I buy*। বঁদ্রেয়ার আরও বলেন " বর্তমানে সংস্কৃতি হচ্ছে ভোগের সংস্কৃতি, ভোগ উদ্‌যাপনের সংস্কৃতি"। আর এধরনের ভোগের উদ্‌যাপনে দেখা যায় সুপার মার্কটগুলোর ভোক্তাদের মধ্যে। ঢাকা শহরে যেমন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জামা কাপড়ের দোকান হতে কাপড় ক্রয় করে মানুষ ঐ ব্র্যান্ডের অংশীদার মনে করে তেমনি এগ্রো সুপার মার্কেট হতে মানুষ দ্রব্য ক্রয় করেও নিজেদের নির্দিষ্ট স্ট্যাটাসের অংশীদার মনে করে । আর এরূপ স্ট্যাটাস নির্মাণে মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তবে সুপার মার্কেটগুলো যেসব কৃষিজপণ্য বিক্রি করে তার উৎপাদনের দায়িত্ব তাদের নিজেদের নয়। অধিকাংশ দ্রব্য যেগুলো তারা সুপার মার্কেটে বিক্রির উদ্দেশ্যে আনে তা পাইকারদের নিকট থেকে টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করে। সুপার মার্কেটগুলো যেসব দ্রব্য বিক্রির উদ্দেশ্যে রাখেন তা সরাসরি নিজেরা উৎপাদন না করলেও উৎপাদন পদ্ধতির উপর তাদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তারা সবজির গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য খামারে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রির উপর বেশী গুরুত্ব দেন। সুপার মার্কেটগুলোতে এরূপ ধারণা প্রতিষ্ঠিত যে, খামারে উৎপাদিত পণ্য 'মান সম্মত'। এরূপ 'মানসম্মত' পণ্যের বিক্রয় কার্যক্রম গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করেছে। গ্রামীণ কৃষকরা পাইকার/ সুপার মার্কেটের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে খামার ভিত্তিক উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে। 'নতুনকৃষি' ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রামীণ কৃষি কাঠামোতে কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা পরবর্তী অংশে মাঠকর্মের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করা হবে।

৫. গ্রামীণ কৃষি কাঠামোর পরিবর্তন ও 'নতুন কৃষি'র সূচনা

গ্রামীণ কৃষি কাঠামোতে 'নতুন কৃষি' ব্যবস্থার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এধরণের প্রভাব গ্রামীণ সমাজের কৃষি ব্যবস্থার চিরায়ত রূপের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। নব গ্রামে দেখা গেছে যে, ১৯৭৯ এর পূর্ব পর্যন্ত এখানে যে কৃষি উৎপাদন হত সেক্ষেত্রে 'আধুনিক প্রযুক্তির' ব্যবহার ছিলনা। কৃষকরা বাজার থেকে কোন প্রযুক্তি বা কৃষি উপকরণ ক্রয় করতনা। কৃষি উপকরণ যেমন বীজ, কীটনাশক, সেচ ব্যবস্থার প্রযুক্তি তারা নিজ গৃহ হতে সরবরাহ করত। ধনী কৃষক যাদের জমি ছিল তারা জমি বর্গা দিত বা গরীবদের নিয়োগ করে চাষাবাদ করত। এক্ষেত্রে চাষ ব্যবস্থা তদারকী করত জমির মালিক। এসময় বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ধান উৎপাদন হত। কৃষকরা যা অতিরিক্ত উৎপাদন করত তা স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রি করত। সবজি বাগানের মালিকরাও নিজেদের চাহিদা মেটানোর পর যা অতিরিক্ত থাকতো তা হাট-বাজারে বিক্রি করত। উৎপাদক নিজের তত্ত্বাবধানে বিক্রির কাজ সম্পাদন করতেন। উৎপাদনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিত জমির মালিক নিজে। এখানে বাজারের উপস্থিতি থাকলেও ক্রেতার পছন্দকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হত না। ৮০'র দশকে এই গ্রামের কৃষি কাঠামোতে 'আধুনিক প্রযুক্তির' বিস্তার ঘটতে থাকে, ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসতে থাকে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে এই গ্রামে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঘটে, যা কৃষকদের সাথে বাজারের যোগাযোগকে আরও বাড়িয়ে তোলে। দু'ধরনের প্রযুক্তি (যেমন- যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক) বাজার থেকে কৃষকদের সংগ্রহ করতে হয়। প্রযুক্তির মালিকানায় ধনীদের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ধনীরা ট্রাক্টর, পাম্প,

শ্যালো মেশিনের মতো যান্ত্রিক প্রযুক্তির মালিকানা লাভ করে। দরিদ্র কৃষকরা অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে প্রযুক্তির মালিকানা লাভ করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এই গ্রামে মোট ৯টি ট্রাক্টর, ৫ টি শ্যালো টিউবওয়েল ছিল যার মালিক ছিল গ্রামের কয়েকজন ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তি। দরিদ্ররা এ ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধনীদের নিকট থেকে তা ভাড়া নেয়।

কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নবগ্রামের কৃষক জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন ধরণের সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে। ধনী প্রযুক্তির মালিকরা নিজেদের জমির চাহিদা মেটানোর পর এ ধরনের প্রযুক্তি ভাড়ার কাজে ব্যবহার করে। এখানে 'আধুনিক প্রযুক্তি'র মালিক ও ব্যবহারকারীর মধ্যে একটি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক তৈরী হয়, যেখানে প্রযুক্তির ভাড়া ও ব্যবহারের সময় নির্ধারিত থাকে। এছাড়া রাসায়নিক প্রযুক্তি যেমন সার, বীজ, কীটনাশক সংগ্রহের জন্য বাজারের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। পূর্বে প্রাকৃতিক সার, বীজ, কীটনাশক তৈরী ও সংরক্ষিত হত গৃহে, যার জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন হত না। কৃষি উপকরণ ব্যয় ছিলনা বললেই চলে কিন্তু 'আধুনিক প্রযুক্তি'র ব্যবহার কৃষি ব্যয়কে বাড়িয়ে তোলে এবং পূর্বে যেখানে মানব শ্রম গুরুত্বপূর্ণ ছিল পরে তা প্রযুক্তি দ্বারা সম্পাদন করা হচ্ছে। ফলে দরিদ্র কৃষকরা কৃষিকাজ ছেড়ে অন্যত্র শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হতে শুরু করে। এছাড়া 'আধুনিক কৃষি' পদ্ধতিতে বৈচিত্র্যময় ফসল উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। পূর্বে যেখানে বোরো, আমন, আউশ ধান উৎপদিত হত তা শুধুমাত্র ইরি চাষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

'আধুনিক প্রযুক্তি' ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন খরচ বহুগুণে বেড়ে যায়। ফলে যারা কৃষির সাথে যুক্ত থাকে তারা উৎপাদন ব্যয় উঠিয়ে আনার জন্য অধিক অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় লিপ্ত হয়, ফলে তারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন শুরু করে। বানিজ্যিক ভিত্তিতে অনেক কৃষক সবজি চাষ শুরু করে। যারা সবজি উৎপাদন করে তারা উৎপাদিত সবজি শুধুমাত্র গ্রাম্য বাজারে নয়, তা বিভিন্ন স্থানে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতে থাকে। ১৯৯৩ এর পর হতে গ্রামের বাইরেও বাজারের বিস্তার ঘটতে থাকে। গ্রাম্য বাজারেও পাইকারদের উপস্থিতি শুরু হয়ে যায়। পাইকাররা গ্রাম হতে কৃষিজাত দ্রব্য ক্রয় করে শহরের বাজারে বিক্রি করে। পাইকাররা গ্রামের উৎপাদিত সবজি পূর্বের চাইতে অধিক দাম দিয়ে ক্রয় করতে শুরু করে। এ ধরণের পাইকার শ্রেণী কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে সবজি ক্রয়ে বেশি উৎসাহ দেখায়। ফলে গ্রামীণ কৃষকদের বাড়ীর আশপাশের খালি জায়গায় অধিক পরিমানে সবজি চাষ করতে দেখা যায়। 'আধুনিক প্রযুক্তি' ব্যবহারের সময় হতেই গ্রামে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সবজি চাষ শুরু হয়। কৃষকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদিত সবজি ক্রয়ের জন্য গ্রামে 'পাইকার' নামক মধ্যবর্তী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে যারা গ্রাম থেকে

সবজি ক্রয় করে শহরের বাজার এমনকি ঢাকা নিয়ে বিক্রি করতে শুরু করে। এলাকার মানুষের মধ্যেও 'পাইকার' নামক মধ্যবর্তী শ্রেণীর পেশায় যোগ দিতে দেখা যায়। গ্রামের মানুষ যারা পূর্বে কৃষি কাজ করত তাদের মধ্যে অনেকেই 'পাইকার' পেশায় যোগ দেয়। তারা গ্রামের সবজি ক্রয় করে শহরের বাজারে সরবরাহ শুরু করে। এই গ্রামের সাথে শহরের যোগাযোগ ভাল তাই পাইকাররা এখান থেকে সবজি পিকআপ ভ্যানে করে ঢাকার কাওরান বাজরের আঁড়তে সরবরাহ করতে শুরু করে।

১৯৯৮ সাল হতে ঢাকার বেশ কিছু সুপার মার্কেটে সবজি বিক্রি শুরু হয়। এছাড়া কিছু প্রতিষ্ঠান বিদেশে সবজি রপ্তানী শুরু করে। এসময় সুপার মার্কেটগুলো নির্দিষ্ট আকারের সবজি টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করতে শুরু করে যার প্রভাব পড়ে গ্রামের সবজি চাষে । মধ্যবর্তী শ্রেণীর পাইকার যারা নবগ্রাম হতে সবজি ক্রয় করে সুপার মার্কেটে বা রপ্তানীকারদের নিকট পৌছে দিত তারা নবগ্রামের কৃষকদের নির্দিষ্ট আকারে সবজি উৎপাদনের জন্য খামার ভিত্তিক সবজি উৎপাদনে পরামর্শ দেন। চিরায়ত পদ্ধতিতে চাষের ফলে সবজির আয়তন বা আকার সব সময় সমান হয়না । কিন্তু খামারে সবজি উৎপাদন করলে তার আকার বা আয়তন সমান করা সম্ভব। আর সুপার মার্কেটগুলোর জন্য সবজির আকার বা আয়তন যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ তাই তারা খামারে উৎপাদিত সবজি তুলনামূলকভাবে বেশী মূল্য দিয়ে ক্রয় করে থাকে । এর প্রভাবে গ্রামের ধনী ব্যক্তিদের অনেকেই এ ব্যবস্থায় 'নতুন কৃষি'র প্রভাবে 'খামার ভিত্তিক' উৎপাদনে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

পাইকারদের অর্ডারে অধিক সবজি সরবরাহ দিতে গিয়ে এখানকার অধিক জমির মালিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল কৃষকদের অনেকেই খামার ভিত্তিক উৎপাদন শুরু করে। এব্যবস্থায় কিছু ধানী জমিকেও সবজি খামারের আওতায় নিয়ে আসা হয়, যেখানে উৎপাদনে কৃষকের পছন্দ নয় বরং বাজারের পছন্দকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। বর্তমানে নবগ্রামের বৃহদাকৃতির সবজি খামারের সংখ্যা ৭টি আর এই খামারগুলির মালিক এলাকার ধনী ব্যক্তি। এই সবজি খামারগুলোর জন্য যে জমি নির্বাচন করা হয় তা পূর্বের মতো গৃহস্থালীর পাশ্ববর্তী জমি নয় বরং পূর্বে যে সব জমিতে ধান চাষ করা হত সেখানেই বেশির ভাগ সবজি খামারগুলো তৈরী করা হয়। পূর্বে যেখানে সবজি চাষের ক্ষেত্রে একই বাগানে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করা হতো সেখানে এখন 'নিবিড় পদ্ধতিতে' সবজি চাষ শুরু হয় এবং একটি জমির পুরো অঞ্চলে শুধু এক প্রকারের সবজিই উৎপাদন করা হয়। এ ধরনের সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে খামারের মালিকরা কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেন। এ ধরনের বিশেষজ্ঞরা সাধারণত ঢাকা থেকে এসে সবজি উৎপাদনের পদ্ধতি খামার মালিককে শিখিয়ে

দিয়ে যায়। পাইকাররা যেসব প্রতিষ্ঠানে সবজি সাপ্লাই দেয় সেসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই এই কৃষি বিশেষজ্ঞদের পাঠানো হয়। সবজির গুনগত মান ঠিক রাখার জন্যই এই বিশেষজ্ঞদের পাঠানো হয়। বিশেষজ্ঞরা যে উপায়ে সবজি চাষ করার পরামর্শ প্রদান করে সেভাবেই খামার মালিকরা খামারে উৎপাদন করে।

খামারভিত্তিক উৎপাদন কৃষিতে গৃহস্থালী শ্রমের গুরুত্বকে হ্রাস করে। বাংলাদেশের চিরায়ত কৃষি ব্যবস্থায় গৃহস্থালীর নারী শ্রমের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, যেখানে গৃহে কৃষি উপকরণ যেমন- বীজ, সার, কীটনাশক প্রস্তুত করতো নারী। কিন্তু খামার ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তা আর নেই। এখানে কৃষি উপকরণ গৃহ হতে সংগ্রহ করা হয়না, বাজার হতে নগদ অর্থের বিনিময়ে এগুলো ক্রয় করে খামারে উৎপাদন কাজে তা ব্যবহার করা হয়। আর গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে যেহেতু নারীদের গৃহের বাইরে শ্রম দেয়াকে 'খারাপ' দৃষ্টিতে দেখা হয় তাই খামারে গিয়ে কাজ করা নারীর পক্ষে অধিকতর সমস্যাজনক হয়ে ওঠে। ফলে খামার ভিত্তিক চাষাবাদে গৃহস্থালীর শ্রমের গুরুত্ব হ্রাস পায়, যা নারীকে কৃষি শ্রম হতে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়।

প্রতিটি খামারের উৎপাদিত সবজি সুপার মার্কেট বা ডিপোতে পৌছায় মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে। নবগ্রামের খামার মালিকরা 'নতুন কৃষি' ব্যবস্থার জন্য সবজি উৎপাদন করলেও তারা সরাসরি ডিপো বা সুপার মার্কেটে বিক্রি করতে পারেনা, এদের সাথে সরাসরি যোগাযোগও হয়না কেননা কোন সুপার মার্কেট বা ডিপো সবজি ক্রয় করে টেন্ডারের মাধ্যমে, যেখানে কিছু লোক আছে যারা সবজি টেন্ডার পায় এবং গ্রাম হতে সবজি ক্রয় করে তা ডিপো বা সুপার মার্কেটে সরবরাহ করে। এই সরবরাহকারীরা 'কন্ট্রাক্টর' হিসাবে পরিচিত। কন্ট্রাক্টররা আবার বিভিন্ন আড়ত বা পাইকারদের কাছ থেকে সবজি ক্রয় করে যাদের সাথে যোগাযোগ থাকে নবগ্রামের খামার মালিকদের। তাই নবগ্রামের খামারে উৎপাদিত সবজি ডিপো বা সুপার মার্কেটে পৌছাতে কয়েক হাত ঘুরতে হয়। এখানকার খামার মালিকরা জানান যে, তারা যে দামে গ্রাম হতে সবজি বিক্রি করেন তার চাইতে প্রায় দ্বিগুন বা তিনগুন দামে সুপার মার্কেট গুলোতে সেই সবজিগুলোই বিক্রি হয়। দু/তিন মধ্যস্থতাকারীর হাত ঘুরে সুপার মার্কেট/ডিপোতে পৌছানোর কারণেই সাধারনত মানুষদের এসব সবজি অধিক দামে ক্রয় করে খেতে হয়। তাই বলা যায় যে 'নতুন কৃষি'র প্রভাব গ্রামবাসীদের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদে উৎসাহী করলেও তা চাষীদের চাইতে মধ্যস্থতাকারীদের ভাগ্যোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মধ্যস্থতাকারী অবস্থানে যে নেটওয়ার্ক সেখানেই অনেক অর্থ চলে যায়। মধ্যস্থতাকারীরা যেভাবে লাভবান হয় সে অনুপাতে উৎপাদক বা শ্রমিকরা লাভবান হতে পারেনা। একারনে খামার মালিকরা মনে করেন যে, যদি মধ্যস্থতাকারীদের বিকল্প ঘটানো যেত তাহলে 'নতুন

কৃষি'র সুফল তারা পেতে পারত। তবে এধরণের উৎপাদন ব্যবস্থায় গ্রামীণ দরিদ্র কৃষকরা কৃষিক্ষেত্রে টিকে থাকতে পারেনা। খামারে যে বিনিয়োগ করা হয় তা একজন দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই খামারের মালিকানা থাকে ধণী শ্রেণীর হাতেই । এ প্রসঙ্গে খামার মালিক নূর মোহাম্মদ বলেন, *"যাগো টাকা নাই তারা খামার দিবার পারেনা, আর যাগো টাকা আছে তারাই খামারের মালিক হবার পারে। টাকা হইলেই খামারের মালিক হওয়া যায়।"*

এই বক্তব্যটির যথার্থতা হচ্ছে যে, যাদের নিজস্ব জমি নাই তারাও লীজ বা ভাড়া জমি নিয়ে শুধু মাত্র নগদ অর্থকে সম্বল করে খামার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তাই নবগ্রামের খামারভিত্তিক উৎপাদনে এধরণের লাভের কথা চিন্তা করে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত নয় এরূপ ব্যক্তিরাও নগদ অর্থ বিনিয়োগ করে খামারের মালিক রূপে আবির্ভূত হচ্ছে। খামার ভিত্তিক উৎপাদনে রাসায়নিক এবং যান্ত্রিক প্রযুক্তি, শ্রমিকের বেতনের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়। নগদ অর্থ ছাড়া কোনভাবেই খামার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। স্থানীয় পদ্ধতিতে গৃহস্থালী ভিত্তিক সবজি উৎপাদনে নগদ অর্থের তেমন কোন প্রয়োজন ছিলনা। উৎপাদনের উপায় হিসাবে বিছন রাখা বীজ দিয়ে সবজি উৎপাদন করা হত যার যোগান দিত গৃহস্থালীর সদস্যরা। কি উৎপাদন, কখন উৎপাদন হবে, কোথায় উৎপাদন বিক্রি হবে তার সিদ্ধান্ত নিত কৃষক নিজেই এবং গরীবরাও নগদ অর্থ ছাড়াই উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকতে পারতো। কিন্তু খামার ভিত্তিক সবজি উৎপাদনে উৎপাদনের মালিকানা চলে গেছে ধনী শ্রেণীর হাতে। তাই ধণী শ্রেণীর জনগোষ্ঠী ছাড়া খামার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। দরিদ্ররা এখানে শুধুমাত্র শ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হয়। ধনী শ্রেণী যেভাবে কারখানায় অর্থ বিনিয়োগ করে পণ্য উৎপাদন করে বিক্রি করে এবং লাভই যেখানে মূখ্য উদ্দেশ্য, সেরূপ খামার ভিত্তিক উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বা লাভই মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

৬. উপসংহার ও মন্তব্য

এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, কিভাবে 'নতুনকৃষি' ব্যবস্থাপনায় ভোক্তা নির্মাণ প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভোক্তা নির্মাণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এগ্রো সুপার মার্কেটগুলোর বিজ্ঞাপন, বাজারজাতকরণ, পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এর মতো বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। 'নতুনকৃষি' ব্যবস্থায় নির্মিত এধরণের ভোক্তার চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে গ্রামীণ উৎপাদন কাঠামোর পরিবর্তন ঘটানোও জরুরী হয়ে পড়ে। এর ফলে গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থায় প্রথাগত উৎপাদন পদ্ধতির পাশাপাশি 'খামার ভিত্তিক' উৎপাদন শুরু হয়। এধরণের উৎপাদন পদ্ধতি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক

সম্পর্ক পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখে। পরিশেষে বাংলাদেশের কৃষক সমাজের পরিবর্তনের স্বরূপ বিশ্লেষণে কতক বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে-

প্রথমত: কেবলমাত্র শ্রেণী কাঠামো দিয়ে গ্রামীণ কৃষি কাঠামো বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। বাংলাদেশের কৃষক সমাজ নিয়ে যেসব গবেষণা কাজ হয়েছে তার অধিকাংশই মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসারে করা হয়েছে, যেখানে কৃষি বলতে শুধুমাত্র গ্রামীণ উৎপাদন ও শ্রেণী কাঠামোকে বোঝানো হয়েছে। শুধুমাত্র উৎপাদন পদ্ধতি ও শ্রেণী কাঠামো বর্ণনার মাধ্যমে 'নতুনকৃষি' তথা এগ্রো ইন্ডাস্ট্রি বা এগ্রো সুপার মার্কেটগুলোর ভোক্তা নির্মাণ প্রক্রিয়া বোঝা সম্ভব নয়। তাই 'নতুনকৃষি'র ধরণকে বিশ্লেষণ করতে হলে বর্তমান ভোক্তা নির্মাণ প্রক্রিয়াকে বুঝতে হবে, যার সাথে বিজ্ঞাপন, বিপণন, পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয় সমূহ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

দ্বিতীয়ত: 'নতুন কৃষিতে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। 'নতুনকৃষি'র ভোক্তাদের চাহিদার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে নতুন ধরণের উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, কেননা প্রথাগত উৎপাদন ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট আকারের কৃষিপণ্য উৎপাদন সম্ভব নয়, এজন্য গ্রামীণ কৃষিতে 'খামার ভিত্তিক' উৎপাদন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছে। পূর্বে যেখানে ধান চাষ করা হত সেসব ধানী জমিকে সবজি খামারের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। এধরণের খামার প্রতিষ্ঠা করা খুবই ব্যয়বহুল, ফলে ধনী জনগোষ্ঠী ছাড়া কেউ খামার প্রতিষ্ঠা করতে পারছেনা । তবে খামার ব্যবসা লাভজনক জানতে পেরে কৃষির সাথে যুক্ত নয় এমন ধনী ব্যক্তিরাও জমি লীজ বা ভাড়া নিয়ে খামার প্রতিষ্ঠা করছে। দরিদ্ররা এখানে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছে। খামারে কি, কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন হবে তার সিদ্ধান্ত খামারের মালিক বা শ্রমিক নিচ্ছেনা, যারা খামারের সবজি ক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ তারা যা পরামর্শ দিচ্ছে সে হিসেবে উৎপাদন কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে। খামার ব্যতীত গ্রামের যে উৎপাদন পদ্ধতি সেখানে উৎপাদনের ব্যাপারে জমির মালিক বা যারা শ্রম দেয় তাদের নিজস্ব জ্ঞান বা সিদ্ধান্তের গুরুত্ব ছিল , কিন্তু খামারের ক্ষেত্রে তা ঘটেনা। একারণে যারা এখানে শ্রম দেয় তারা নিজেদের 'কৃষক' হিসেবে পরিচয় না দিয়ে শ্রমিক হিসেবে নিজেদের ভাবতে শুরু করে। অপরদিকে মালিকরা বিনিয়োগকারীর ভূমিকা পালন করার ফলে নিজেদের কৃষক নয় বরং খামারের 'মালিক' হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করে। তাই এখানে শিল্প ব্যবস্থার মত মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

টীকা:

১.এই প্রবন্ধটি আমার এম.এস.এস থিসিস গবেষণার আলোকে লিখিত। এ গবেষণার মূল বিষয় ছিল 'নতুন কৃষি' ব্যবস্থা কিভাবে ভোক্তা নির্মান করছে এবং এধরণের ব্যবস্থা গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থায় কি ধরণের প্রভাব ফেলছে তা বিশ্লেষণ করা। উল্লেখ্য যে,এই গবেষণা কর্মটি কোন নির্দিষ্ট একটি 'মাঠ'

কে কেন্দ্র করে সম্পাদন করা হয়নি। বরং গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাকে গবেষণা কাজ সম্পাদন করতে হয়েছে। ভোক্তা নির্মান প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের জন্য আমাকে ঢাকা শহরের এগ্রো সুপার মার্কেটের বিক্রয় পদ্ধতি, বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা বুঝবার জন্য পত্রিকার বিজ্ঞাপন, গ্রামীণ কৃষি কাঠামোর পরিবর্তন বুঝবার জন্য গ্রামীণ কৃষি কাঠামোকে 'মাঠ' হিসেবে বেছে নিতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠান, গ্রাম ও ব্যক্তির নাম ছদ্ম নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, 'নতুন কৃষি'র প্রভাবে গ্রামীণ চিরায়ত কৃষির কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা বোঝার জন্য টাঙ্গাইলের একটি গ্রামে মাঠ কর্ম সম্পাদন করা হয়। এই গ্রামটির নামও ছদ্ম নাম হিসেবে 'নবগ্রাম' দেয়া হয়েছে।

২. এন্ডি হল এর 'নতুন কৃষি'র ধারণাটি আমি এই প্রবন্ধে ব্যবহার করেছি। তত্ত্বীয় আলোচনায় 'নতুন কৃষি' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৩. মাইকেল কিয়ার্নি (Kearney, 1996) কৃষক সমাজের পুনঃ প্রত্যয়ন (Reconceptualizing) করতে আগ্রহী। তার মতে চিরায়ত কৃষক ধারণায়ন এবং কৃষক গৃহস্থালী বর্তমানে অনেক পরিবর্তিত। অভিবাসন, বাজার ভোক্তার চাহিদা, কৃষি বহির্ভূত সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে 'কৃষক সমাজের' উপাদান সমূহ আর আগের মতো নেই। তাই কিয়ার্নি কৃষক সমাজের পুনঃপ্রত্যয়নের পক্ষপাতি।

৪. বাংলাদেশে গ্রামীণ গবেষণায় মার্ক্সীয় পদ্ধতি অনুসরণে জাহাঙ্গীর (১৯৯৩) দেখান যে, শ্রেণী হচ্ছে সমাজ কাঠামো বোঝার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়। উৎপাদন উপায়ের মালিকানার উপর কার কতটুকু কর্তৃত্ব আছে তা দিয়ে বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো বোঝা জরুরী। বিপরীতে ম্যাক্স ওয়েবারের শ্রেণী, ক্ষমতা ও মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন অথচ স্বাধীন চলকের মাধ্যমে বাট্রোসি (১৯৭০) দেখান যে, শ্রেণী কোন নির্ধারনী একক নয়। একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি অর্থনৈতিক ভাবে আধিপত্যশীল না হয়েও সমাজে ক্ষমতাশালী হতে পারে। মার্ক্সীয় গবেষণা পদ্ধতি শ্রেণীকে নির্ভরশীল চলক (Dependent Variable) হিসেবে দেখে। বিপরীতে ম্যাক্স ওয়েবার শ্রেণী, মর্যাদা ও ক্ষমতাকে স্বাধীন চলক (Independent Variable) হিসেবে দেখতে চায়।

৫. Hall ও Ahmed যাকে 'নতুনকৃষি' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন সেই 'নতুনকৃষি' ব্যবস্থায় গ্রামীণ উৎপাদক শ্রেণীর অবস্থান এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া কোন প্রক্রিয়ায় উৎপাদকের নিকট হতে কাঁচা কৃষিজাত পণ্য সুপার মার্কেটে প্রবেশ করে , কিভাবে 'নতুনকৃষি'র ভোক্তা নির্মিত হয় তা তুলে ধরা হয়েছে। তবে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গত দু'দশক যাবত বাংলাদেশে ' উন্নয়ন বিকল্প নীতি নির্ধারনী গবেষণা ' (উবিনীগ) নামক প্রতিষ্ঠান কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির অপকারিতার কথা উল্লেখ করে স্থানীয় প্রযুক্তিতে চাষাবাদ করার জন্য গ্রামীণ কৃষক জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করছে, যার নামকরণ করেছে " নয়াকৃষি আন্দোলন"। এদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কৃষি কাজে বিদেশী প্রযুক্তি বর্জন। এই লক্ষ্য নিয়ে তারা সভা-সমাবেশ সহ নানা ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম করে আসছে। এই প্রবন্ধে "নতুনকৃষি" বলতে "নয়াকৃষি আন্দোলনকে" বুঝানো হচ্ছনা বরং বিগত কয়েক বছর যাবত কৃষি রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠান এবং এগ্রো সুপার মার্কেট বাংলাদেশের কৃষি কাঠামেতে কিরূপ প্রভাব ফেলছে, কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভোক্তা নির্মাণ করছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৬. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উত্তর আধুনিক বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে খান (২০০৬) এর কাজে। তিনি দেখাচ্ছেন যে, কিভাবে বাজারমুখী পণ্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি ফ্যান্টাসি তৈরী করছে, যা মোটেও কোন অকৃত্রিম উত্তর আধুনিক রূপ নয় বরং একটি জগাখিচুরি রূপ।

তথ্যপঞ্জী

Ahmed, Z. (2005) ``A diagnostic innovation systems syudy of shrimp sector in Bangladesh"A concept paper prepared for the United Nations University, the Netherlands, Funded by the World Bank through DFID, September 2005.

Baudrillard, J. (1975). The mirror of production, St louis, MO: Telos press.

Baudrillard, J. (1979). ``The Consumer Soceity" in Jean Baudrillard selected Writtings, ed. Markposter, Stanford, CA. Stanford University press.

Bertocci, P.J. (1970) Elusive Villeges: Social Structure & Community Organization In Rural East- Pakistan, Unpublished, Ph, D. Dissertation, Michigan State University

Chayanov, A.V. (1925) The Theory of Peasant Economy, Daniel Thorner (Trans.) Homewood, Richard,C. Irwin for American Economic Association.

Hall, A. (2005). Innovating to prosper Turning the `` New Agriculture'' into a sustainable growth . www. update.unu.edu.

Kearney,M. (1996) Reconceptualizing Peasantry: Anthropology and Global Perspective, Westview Press, USA.

Shanin, T. (1972) `Introduction' in T. Shanin (eds.) Peasants and Peasant Soceities, Penguin Book, Hanondsworth.

Wolf, E.R. (1966) Peasant , Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New jersy.

Wolf, E.R. (1969) Peasant Wars of the Twentieth Century, Hyper and Row, New York.

World Bank (2007) Enhanching Agricultural Innovation: How to go beyond the strnghthening of Research Systems, The World Bank, Washington DC 20433.

Westergaard ,K. (1980) Boringram: An Economic and social Anlysis of a Village in Bangladesh, Rural Development academy, Bogra, Bangladesh.

আইয়ুব, সান্ত্বনা (২০০৪). *বাংলাদেশে কৃষক সমাজ পুন:প্রত্যয়ীকরণ*, (অপ্রকাশিত), এম.এস.এস. গবেষণা, নৃবিজ্ঞান বিভাগ , জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

খান, রাশেদা রওনক (২০০৬) উত্তর আধুনিকতা ও গণ মাধ্যম : কেইস বাংলাদেশের টিভি বিজ্ঞাপন, *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা,* সংখ্যা-১১, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

জাহাঙ্গীর, বি.কে. (১৯৯৩) বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।